৩ নভেম্বর: জীবন লম্বা নয়, বড় হওয়া জরুরি

প্রভাষ আমিন

কয়েক বছর আগে ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় কারাগার কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরের পর একবার পরিত্যক্ত কারাগারে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সুযোগটি আমি হারাতে চাইনি। পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে দুটি ঐতিহাসিক স্থান দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। একটি হলো বঙ্গবন্ধু কারাগারের যে সেলে থাকতেন সেটি, আর চার নেতাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেই জায়গাটি। তখন কাজ চলছিল বলে বঙ্গবন্ধুর সেলটি দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তবে চার জাতীয় নেতাকে যে সেলে হত্যা করা হয়েছিল, এখন যেটি 'মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ স্মৃতিকক্ষ' হিসেবে সংরক্ষিত, সেটি দেখার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের যে অভিশপ্ত সেলে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল, তার কথা শুনেছি অনেক, ছবিও দেখেছি। কিন্তু কাছ থেকে দেখার যে আবেগ, ৭৫এর খুনীচক্রের প্রতি ঘৃণা বেড়েছে শুধু। কারাগার হলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আর সেখানেই কি না মধ্যরাতে একটি জাতির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এখনও সেই সেলের গায়ে গুলির চিহ্ন যেন আমাদের জাতির কপালে কলঙ্কতিলক হয়ে লেগে আছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ৭৫ সালটি শোকের, বেদনার, গ্লানির, ষড়যন্ত্রের, নিষ্ঠুরতার। ৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর এই আড়াই মাস সময়ে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল সবকিছু। ৭৫এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। ৭ নভেম্বর নিষ্ঠুর এক অধ্যায়ে ক্ষমতায় আসেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানের উত্থানের পর শুরু হয় নিষ্ঠুরতার আরেক অধ্যায়। তবে আগস্ট থেকে নভেম্বরে ঘটে গেছে আরো অনেক নিষ্ঠুরতা আর ষড়যন্ত্র। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ঘাতক চক্র ঘাঁটি গাড়ে বঙ্গভবনে। খুনী মোশতাককে পুতুল বানিয়ে খুনী চক্র বঙ্গভবনে বসেই দেশ শাসন করছিল। তাতে দেশ তো বটেই ভেঙে পড়েছিল সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ডও। সেনাবাহিনীর মূল অংশটি চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিল। বঙ্গভবনে বসে কয়েকজন খুনীর দেশ চালানোর বিরুদ্ধে ছিল তাদের অবস্থান। খুনী চক্র যখন বুঝে যায় তাদের সময় ফুরিয়ে আসছে, তখনই তারা আবার মাতে হত্যার উৎসবে। ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে সশস্ত্র সেনা সদস্যরা কেন্দ্রীয় কারাগারে যায়। সশস্ত্র কোনো ব্যক্তির কারাগারে ঢোকার নিয়ম না থাকলেও বঙ্গভবন থেকে ফোনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি খুনী মোশতাক সেনা সদস্যরা যা চায় তাই করতে দেওয়ার নির্দেশ দিলে অসহায় কারা কর্তৃপক্ষের আর করার কিছুই থাকে না। আগে থেকে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী কারাগারে একটি কক্ষে একত্রিত করা হয় চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। তারপর খুব কাছ থেকে ঠা ঠা গুলি। পৃথিবীর ইতিহাসে রচিত হলো অবিশ্বাস্য এক হত্যাকাণ্ড, সবচেয়ে নিরাপদ কারাগারে হত্যা করা হলো দেশের চার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার মাত্র আড়াই মাসের মাথায় তাঁর চার সহযোগীকে হত্যার ঘটনাটিও রাজনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আরেকটি অভ্যুত্থান যখন প্রায় অবধারিত, তখন খুনী চক্র ভেবেছে এই অভ্যুত্থানে বুঝি আবার আওয়ামী লীগই ফিরে আসছে। যদিও খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সাথে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। তবুও সেই অভ্যুত্থানকে আওয়ামী লীগ এবং ভারতের পক্ষে বলে অপপ্রচার চালিয়ে মাত্র চারদিনের মাথায় সে অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরলেও যাতে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ না থাকে, সেটা নিশ্চিত করতেই কারাগারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল খুনী চক্র। তারপর জেল হত্যাকাণ্ডের নির্মমতা জানাজানি হওয়ার আগেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল খুনীরা। ৩ নভেম্বরে কারাগারে নিহত হওয়া জাতীয় চার নেতা মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়েছিলেন বিজয়ের নিশানায়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আর তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নিহত বাকি দুজনও ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। ৭৫এ খুনীদের সাথে হাত মেলানো খন্দকার মোশতাকও একাত্তরের প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মোশতাক পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ৭৫এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল নতুন সরকার। বঙ্গবন্ধুর মরদেহ ধানমন্ডির ৩২ নাম্বারের সিঁড়িতে রেখেই তাঁর মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য বঙ্গভবনে শপথ নিতে ছুটে গিয়েছিলেন। তখন এমন একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও দেশে আওয়ামী লীগের সরকারই আছে। তখন খুনী চক্রের সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এই চার নেতাসহ আওয়ামী লীগের অল্প কয়েকজন নেতা। ১৫ আগস্টের পর খুনীচক্রের সাথে হাত মেলানো অনেকে পরে দাবি করেছেন, অস্ত্রের মুখে জীবনের মায়ায় তারা খুনী চক্রের আনুগত্য মানতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু জাতীয় চার নেতা সেই ভীরু কাপুরুষদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; জীবন লম্বা নয়, বড় হওয়া জরুরি। খুনী চক্রের সাথে হাত মিলিয়ে যারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন, তারা যাপন করে গেছেন এক গ্লানির জীবন। ঘৃণা আর অপবাদই বহন করতে হয়েছে তাদের। কিন্তু জাতীয় চার নেতা জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, জীবনের চেয়ে আদর্শ আর আনুগত্যের মূল্য অনেক বেশি। অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেননি বলেই মৃত্যুর পরও তাঁরা জাতীয় বীর। ইতিহাসে তাঁদের নাম সবসময় স্বর্ণাক্ষরে বীর হিসেবেই লেখা থাকবে। খন্দকার মোশতাক সবসময় কাপুরুষ, তাজউদ্দিন চিরদিনের বীর। অথচ শেষ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দিন আহমদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছিলেন তাজউদ্দিন, অথচ বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় ছিলেন মোশতাক। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য খুনীদের সহজ টার্গেট হতে পারতেন তাজউদ্দিন। কিন্তু তারা বেছে নিয়েছিল মোশতাককে। জাতীয় চার নেতা যেভাবে জীবনের মায়া না করে খুনীদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে করেছিলেন, তা রাজনীতির প্রতি আমাদের আস্থা বাঁচিয়ে রাখে। আওয়ামী লীগের অনেকেই মোশতাকের মন্ত্রিসভায় শপথ নিলেও সবাই যাননি। জাতীয় চার নেতার খুনীদের প্রত্যাখ্যানেই লুকিয়ে ছিল আওয়ামী লীগের পুনর্জন্মের বীজ। সেই বীজ থেকেই নতুন চারা গজিয়েছে। ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে সেই চারাটুকু পেয়েছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে আবার মহীরুহতে পরিণত করতে পেরেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বর ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটলেও তার বিচারের পথ রুদ্ধ ছিল ২১ বছর। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরার পর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জেল হত্যার বিচারের পথ সুগম। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে খুনীদের বিচারও হয়েছে। তবে পালিয়ে থাকায় সব খুনীর রায় কার্যকর করা যায়নি। আওয়ামী লীগ অবশ্য চেষ্টা করছে খুনীদের ফিরিয়ে এনে বিচার করতে। শুধু খুনীদের বিচারেই সন্তুষ্ট হলে চলবে না। পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশও উন্মোচন করতে হবে। আর নতুন প্রজন্মের কাছে জানাতে হবে জাতীয় চারনেতার ত্যাগের ইতিহাস। মানুষ যেন জানতে পারে এই বাংলায় খন্দকার মোশতাকের যেমন জন্ম হয়; তেমনি এই জাতিকে গর্বিত করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামানের মতো সূর্যসন্তানরাও।